এই সময়
সংবাদপত্র

ক থা স রি ৎ

যদি পৃথিবীটাকে নিজের মনের মতো করে গড়তেই না পারা যায়, তা হলে আমাদের জন্য পৃথিবীর মানে কী? ।

টনি মরিসন

অবশেষে চিচিং ফাঁক

ভোটের আগে নির্বাচনী তহবিল সংক্রান্ত তথ্য জরুরি

অবশেষে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ড জমা দিতে বাধ্য হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সুপ্রিম কোর্টের ভারতের প্রধান বিচারপতি-সহ পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এসবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছিল, নির্বাচনী বন্ড কে কিনেছে এবং কোন রাজনৈতিক দল সেটি পেয়েছে তার সব তথ্য ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ১৩ মার্চের মধ্যে সেই তথ্য প্রকাশ করার। কিন্তু গত সপ্তাহে এসবিআই শীর্ষ আদালতের কাছে অনুরোধ করে যাতে তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। শীর্ষ আদালত ওই আবেদন খারিজ করে দেয়। যদি আবেদন মঞ্জুর হত, তা হলে ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পরেই নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারতেন ভোটাররা, তথা নাগরিকরা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের জন্য কে কত টাকা ঢেলেছে, সেই টাকার উৎস সম্পর্কে সামান্যতম তথ্যও না জেনে ভোটাররা বাধ্য হতেন ভোট দিতে। ফলে এসবিআই-এর আবেদন খারিজ করে শীর্ষ আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোটের আগেই ভোটারদের কাছে ভোট-প্রচারের তহবিল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে শীর্ষ আদালতের তৎপরতা প্রশংসনীয়। ৬ মার্চের মধ্যে কেন নির্বাচনী কমিশনকে জানানো হয়নি তথ্য, সে ব্যাপারেও এসবিআই-কে প্রশ্ন করেছিল শীর্ষ আদালত। আদালতের জিজ্ঞাসা, নির্দেশ পাওয়ার পরেও এসবিআই ওই দীর্ঘ ২৬ দিন কী করেছে? এসবিআই-এর আবেদনে সে সম্পর্কে কোনও কথা বলা হয়নি। অনুদান প্রদানকারীদের যাবতীয় তথ্য ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সত্ত্বেও এসবিআই কেন সময় নষ্ট করল, সে প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। দেশের প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'কার্যকরী ভোটের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল সম্পর্কে তথ্য ভোটারদের কাছে থাকা উচিত।'

এসবিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিতে ২২ হাজার ২১৭টি নির্বাচনী বন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। এসবিআই-এর কর্মীসংখ্যা কম নয়, ২২ হাজার ২১৭টি বন্ডের ক্রেতা ও প্রাপকের তথ্যে বের করা খুব বড় কাজ ছিল না, কিন্তু তার পরেও অযথা কালক্ষয়ে কি প্রশ্ন উঠতে পারে, এর পিছনেও কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব ছিল? নির্বাচন কমিশনকেও এ বার তৎপর হতে হবে, ১৫ মার্চের মধ্যে প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে তাদের। এসবিআই-কে তথ্য জমা দেওয়ার জন্য প্রাথমিক ভাবে তাদেরই তাগাদা দেওয়া উচিত ছিল, যা হয়নি। আবার দেরি করা ঠিক নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের তহবিল সংক্রান্ত তথ্য। ভোটাররা তা জানলেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া অর্থবহ হয়।

মানুষ কূটনীতির দাস?

বিদেশের সঙ্গে দেশবাসীর সম্পর্ক কেমন হবে সেই বিষয়টিকে বিদেশ মন্ত্রক খানিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঠিকই। কিন্তু আধুনিক মানুষ আদতে 'অচেনা' রাষ্ট্রপ্রধানদের 'অদেখা' তরজায় কতটা গুরুত্ব আরোপ করে, সেটি ভাবা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের নাগালে এমন অনেক বিষয় থাকে যা আন্তর্জাতিক কূটনীতির আওতাভুক্ত নয় কোনও কালেই। যেমন, কোনও দেশের কোনও মানুষ অপর দেশের সামরিক প্রধানের প্রাণাধিক প্রিয় হলেও, সে কারণে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমরসজ্জায় খামতি দেখা যাবে, এমনটা হয় না। তবে, যুদ্ধের মাঝে পরস্পর 'শত্রু' দেশের জনগণ পরস্পর 'শত্রু' দেশের শিল্পীদের কাজের গুণমুগ্ধ হয়েছে, তা প্রকাশ্যে ব্যক্তও করেছে, এমন নজির বহু। গত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ব্যক্তিগত আখ্যান থেকেও তেমন কাহিনি মেলে। অতএব মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক মতানৈক্য নিয়ে আলোচনার সময়ে যে ভাবে সাধারণ ভারতীয়রা সে দেশে বেড়াতে গেলে আতিথেয়তায় খামতি হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন, সেটি তাঁর মহানুভবতার লক্ষণ হলেও, অপ্রয়োজনীয় ছিল। সে দেশে যে ভারতীয়রা যায়, তাঁদের সঙ্গে সেখানে সেখানকার সাধারণ মানুষের দেখা হয়। সমুদ্রের পারে, অনন্ত আকাশের তলায় বাদানুবাদের অবকাশ কোথায়? সাধারণ মানুষ সব সময়ে কূটনৈতিক দোষে দুষ্ট হয় না।

অ সং খ্যা

১৭৫০০০

(এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার)— ২০০৯ সালের আয়লা সাইক্লোনে ধ্বংস হওয়া বাড়ির সংখ্যা। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দি ন কে দি ন

১৩ মার্চ

২০০৪: উস্তাদ বিলায়েত খান প্রয়াত হন। ইমদাদখানি ঘরানার এই কিংবদন্তি সেতারবাদক বিভিন্ন সময়ে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৯৪: মহম্মদ সিরাজ জন্মগ্রহণ করেন হায়দরাবাদে। আন্তর্জাতিক স্তরে তিনি ২৬টি টেস্ট ম্যাচ ও ৪১টি এক দিনের ক্রিকেট খেলে যথাক্রমে ৭৪ ও ৬৮টি উইকেট নিয়েছেন।

তাপস জোল্‌নুন্‌ মেসরী

গিরিশচন্দ্র সেন

বো ধি বৃ ক্ষ

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'বহুকাল যাবৎ একজন সাধুপুরুষ তথায় কুটীরে তপস্যা করিতেছেন। একদিন কেহ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে এরূপ তর্ক করে যে, লোকে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি দ্বারা উপার্জন না করিলে জীবিকা প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরিশ্রমের উপর লোকের জীবিকা নির্ভর করে, শুদ্ধ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নহে। এই কথা শুনিয়া সেই সাধু প্রতিজ্ঞা করেন, 'কি! মানুষ ব্যবসায়াদি না করিলে ঈশ্বর জীবিকা-দানে অক্ষম হন? দেখি, অদ্যাবধি আমি মনুষ্যের উপার্জিত জীবিকা ভোগ করিব না।' তদনুসারে কয়েক দিন ক্রমাগত তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না। করুণাময় ঈশ্বর মধুমক্ষিকাপুঞ্জকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। উক্ত মক্ষিকাকুল তাঁহাকে মধুদান করিতে লাগিল।' জোল্‌নুন্‌ বলিলেন, 'এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইল; প্রতীতি হইল যে, যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহাদের উপায় করিয়া দেন। অনন্তর চলিয়া আসিতেছিলাম, পথে একটি ক্ষুদ্র অন্ধ পক্ষীকে তরুশাখা হইতে ভূতলে অবতরণ করিতে দেখিলাম। ভাবিলাম, দেখা যাউক, এই হতভাগ্য পক্ষী কোথা হইতে কিরূপে আহার প্রাপ্ত হয়। দেখি, সে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল, মৃত্তিকার নিম্ন হইতে শস্যকণা ও নির্মল জল বহির্গত হইল। পক্ষী সেই শস্য ও জলে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্বার শাখায় যাইয়া বসিল। আমি ইহা দর্শন করিয়া বিহ্বল হইলাম, ঈশ্বরনির্ভরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, প্রকৃতভাবে নব জীবনের অভ্যুদয় হইল।' ('তাপসমালা: মোসলমান তপস্বীদের জীবনবৃত্তান্ত' থেকে গৃহীত)

তৃণমূল কংগ্রেস গত বিধানসভার ভোট ধরে রাখতে পারলে বিজেপি-র হালে পানি পাওয়া মুশকিল

বঙ্গীয় গেরুয়া শিবিরের ভরসা দুই গুজরাটি মুখ

লোকসভা ভোট এসে পড়ল। ভারতীয় রাজনীতি আরও বেশি কর্তৃত্ববাদের দিকে ঝুঁকবে কিনা, তারই ফয়সালা হবে এই নির্বাচনে। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

লাল-নীল-সবুজের মেলা। নির্বাচনের আগে কলকাতার ঘুড়ির দোকানে দলীয় চিহ্নের বাহার *শুভ্রজিৎ চন্দ্র*

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের মরশুম এসে গেছে। এ বারের লোকসভা ভোট ভারতের নির্বাচনী লোকতন্ত্রের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভোট হতে চলেছে। এই নির্বাচন নির্ধারণ করবে যে ভারতীয় রাজনীতি একনায়কভিত্তিক কর্তৃত্ববাদের দিকে আরও বেশি ঝুঁকবে নাকি বিরোধী দলগুলোর জোট সরকার তৈরি হবে।

রাহুল গান্ধী আবার কেরালার ওয়েনাড় কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু সেখানে মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি নয়। বামফ্রন্ট। তা হলে তিনি কি বিজেপি-বিরোধী জোট সরকার তৈরি করতে আদৌ সিরিয়াস? তিনি যদি উত্তর ভারতের কোনও কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতেন যেখানে মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি, তা হলে বিজেপি-বিরোধী ভোটারদের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ত। তাঁর দল যদি উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে বিজেপি-র বিরুদ্ধে সফল হয়, তা হলে ২০২৪ সালের নির্বাচন আবার হয়তো ২০০৪ সালের মতো হয়ে যেতে পারে। ২০০৪ সালে যখন অনেকে ধরেই নিয়েছিল যে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আবার প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে এবং সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশ 'ইন্ডিয়া শাইনিং' প্রচারে মেতেছিল, ঠিক তখন ভারতের গ্রামগঞ্জের গরিব মানুষ, শহরের গরিব বস্তিবাসী-সহ মধ্যবিত্তের একাংশ চুপচাপ বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত দিয়েছিল। সে রকম কোনও একটি মোড়-ঘোরানো পরিস্থিতি তৈরি করতে গেলে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে শুধু আসন সমঝোতা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। একটি বিকল্প সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচি কী হবে, তা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। এবং সেই কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার গণমাধ্যম, সমাজমাধ্যম এবং ছোটো ও বৃহৎ জনসভাগুলিতে করতে হবে।

এই ভোটে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের দু'টি সমস্যা। প্রথম, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় 'নো ভোট টু বিজেপি' নামক যে জোরদার প্রচার হয়েছিল সেই প্রচার এখনও পর্যন্ত তেমন প্রকট নয়। দ্বিতীয়, ইন্ডিয়া জোটের নাম দিয়েছিলেন তৃণমূল সভানেত্রী। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সেই জোট নেই। অন্তত কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করলে বিজেপি-বিরোধী মানুষের মধ্যে কোনও দোদুল্যমানতা থাকত না। কেউ বলতে পারেন যে, বিজেপি-বিরোধী ভোট পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের পক্ষে সংহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সে কথা স্বীকার করে নিলেও মনে রাখতে হবে যে, এটা লোকসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচন নয়। লোকসভা নির্বাচনের ইস্যু আলাদা হয়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যত বেশি দলের সংহতি, তত বিজেপি-বিরোধী ভোটারদের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভোট দেওয়ার জন্য যাতে কেন্দ্রে একটি বিকল্প সরকার গড়া যায়, তার জন্য দরকার ছিল বিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক একতা। তা বিজেপি বুঝছে। আর তাই তারা নিজেদের ঘর গুছিয়ে, অন্য দলের ঘর ভেঙে বৃহত্তর এনডিএ জোট তৈরি করছে। এই ভোটে আরএসএস বিজেপি-কে কতটা সাংগঠনিক ভাবে সমর্থন করে, তার উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বহু রাজ্যে বিজেপি-র ফল। ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি সত্যিই আরএসএস চেয়েছিল?

এই নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে অনেকগুলো ইতিবাচক দিক আছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প (বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং স্বাস্থ্য সাথী), ছাত্র-ছাত্রী, যুবদের জন্য বিভিন্ন সরকারি অনুদান এবং আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি তৃণমূলের জনসমর্থনকে সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠেছে পশ্চিমাঞ্চলে, যা সেখানকার বেকারত্ব মেটাতে কিছুটা সাহায্য করবে। তবে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গে আরও শ্রমনিবিড় শিল্প দরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে পরিযান ঠেকাতে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন ক্ষেত্রে আরও মাঝারি এবং বড় পুঁজির বিনিয়োগ এবং তার সঙ্গে একটু সৃষ্টিশীল চিন্তা রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার আনতে পারে। রাজ্য সরকারকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু এ সব করার জন্য রাজ্যের ধার কমাতে হবে। যে দেনা রাজ্য করেছিল, সেই দেনা মেটানোর জন্য নিয়মিত সুদ দিতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সেই দেনা পূর্বতন সরকারগুলোর ধার এবং 'মা-মাটি-মানুষ' সরকারের ধার। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক পুনর্বণ্টন নিয়ে তৃণমূলকে মনোযোগী হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ কাল থেকে কেন্দ্রের ধারের মূল এবং সুদ কিছু ফেরত দেবে না। এবং তার যুক্তি হিসেবে তৃণমূল বলতে পারে যে যেহেতু কেন্দ্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গের হকের টাকা দিনের পর দিন আটকে রেখেছে, তাই রাজ্য সরকার কেন কেন্দ্রীয় সরকারকে পুরাতন ধারের টাকা ফিরিয়ে দিতে যাবে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল যদি রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের সমস্ত ঋণ মকুব করার দাবি করতে পারে, তা হলে ভারতের ইতিহাসে ফেডারেল রাজনীতির এক নতুন দিক খুলে যেতে পারে। তারা বলতেই পারে যে বড় কর্পোরেট পুঁজিকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো ঋণ মকুব করে থাকে, তা হলে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য কী দোষ করল? দেশ চালানোর ক্ষেত্রে তো সব সময়ে বানিয়ার মতো ব্যবহার করা চলে না।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল যা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কোনও একক দল হিসেবে রেকর্ড ছিল। কারণ তা ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পাওয়া ৪৭.২৯% ভোটের চেয়েও বেশি। তুলনায় বাম আমলে (১৯৭৭-২০১১) সিপিআই(এম) সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছিল ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে (৩৯.৩০% ভোট) আর বামফ্রন্ট সম্মিলিত ভাবে ভোট পায় ৫২ শতাংশ, সরকারে থাকার দশ বছর পর। এই বিশ্লেষণ করার সময় ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে ধরা হচ্ছে না, যখন কংগ্রেস ৪৯ শতাংশের উপরে ভোট পায় কারণ সেটি অবাধ নির্বাচন ছিল না।

কেন কেরালা? তিরুনেলি মন্দিরে দর্শনার্থী রাহুল গান্ধী ▶

বিধানসভার তুলনায় লোকসভায় বিজেপি এবং কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলগুলির ভোট বাড়ে। এই নির্বাচনে বিজেপি-র ভোট বিধানসভার তুলনায় যদি সামান্য বাড়ে, তাতেও বিজেপির পক্ষে খুব ভালো ফল করা সম্ভব নয় যদি তৃণমূল নিজেদের ভোট ধরে রাখতে পারে। এ দিকে বিজেপি নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত। সংগঠন চাঙ্গা করার জন্য কখনও বলছেন পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৫টি আসন পাবেন, কখনও আবার ২৫টি আসন আর সবেমাত্র বিজেপি-তে যোগ দেওয়া এক প্রাক্তন বিচারপতি বলছেন ৪২টি আসন পেতে হবে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের হিসেব ধরলে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো আসন পেয়েছিল তার অর্ধেক পাওয়াও কঠিন হতে পারে যদি তৃণমূল বিধানসভায় পাওয়া ভোট ধরে রাখতে পারে।

তৃণমূল-বিরোধী শক্তি হিসেবে ক্রমশ বামফ্রন্ট ধীর গতিতে উঠে এলেও জনমানসে কিছুটা প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বামফ্রন্টের মূল সমস্যা অন্ধ তৃণমূল-বিরোধিতা। সম্ভবত ২০১১ এবং ২০১৬ সালের পরাজয় বামফ্রন্ট নেতৃত্ব হজম করতে পারেননি। এবং মতাদর্শগত দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কিছুটা দিশেহারা। কংগ্রেসের হাত ধরবেন না ধরবেন না, সেটা যেমন একটি বড় প্রশ্ন, তেমনই গত ৬ মার্চ সিপিআই(এম)-এর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ ভারত সরকারের যে ব্যক্তিপূজা-ধর্মী বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে তা অনেক বাম সমর্থককে আঘাত করেছে। ওই দিন বেশ কয়েকটি 'বাজারি' সংবাদপত্রে কিন্তু ওই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়নি। তাই অনেকে প্রশ্ন তুলবে যে পার্টিটার কি তা হলে এখন এ রকম খারাপ অবস্থা যে, জানুয়ারি মাসের অত্যন্ত সফল ব্রিগেড সমাবেশ করার পরে শেষে মোদীর প্রচারে ব্যস্ত ভারতের সব থেকে বড় কমিউনিস্ট পার্টির এক রাজ্য শাখার সংবাদপত্র?

১০ মার্চ ব্রিগেডে, তৃণমূলের জনগর্জন সভা দারুণ সফল হয়েছে। বামফ্রন্টের যুব সংগঠনের ইনসাফ যাত্রার ৭ জানুয়ারির সভায় যত শক্তি প্রদর্শন করেছিল বাম যুবসংগঠনগুলি, তার যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। তুলনায় রাজ্যে, বিজেপি-র সংগঠন দুর্বল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গো-হারান হারার পর বিভিন্ন নির্বাচন এবং উপনির্বাচনে বিজেপি-র ভোটের হার ক্রমশ নিম্নমুখী। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র কোনও জননেতা বা জননেত্রী নেই যিনি তৃণমূলের সর্বাধিনায়িকার জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। যাঁরা আছেন, তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তুলনায় রাজ্যের সব থেকে বড় বামপন্থী পার্টির এক উদীয়মান যুবনেত্রীর তাৎক্ষণিক উপস্থিতি এবং ক্ষিপ্রতা এক সময়ে রাজ্যে কংগ্রেসের যুবনেত্রীর (যিনি বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন) কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিজেপি-কে তাই গুজরাটি নেতাদের (মোদী ও শাহ) উপর ভরসা করতে হচ্ছে যা তৃণমূলের জন্য আরও সুবিধাজনক। কারণ তৃণমূল গর্জন করছে এই বলে যে, বহিরাগত অত্যাচারীদের তারা বিসর্জন দিতে চায় এই ভোটেই। বিজেপি-র কোনও নেতা বা নেত্রী হয়তো বলতে পারেন যে 'জো গরজতে হ্যায় ওহ বরসতে নহি (যারা গর্জায় তারা বর্ষায় না)'। কিন্তু তাতে তৃণমূল স্তরের মানুষের কিছু যায়-আসে না। কারণ কথাটি আকাশের মেঘের সঙ্গে তুলনীয়। যারা রক্ত-মাংসের মানুষ, যারা জীবন-যন্ত্রণার উপলব্ধি দিয়ে সাত-পাঁচ ভেবে ভোট দেন তাদের ক্ষেত্রে নয়। আর রাজ্যের রাজনীতি-সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে তো একদম কথাটি খাটে না।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

রাশিয়ার প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন

আলেক্সেই নাভালনি। পুতিন জমানায় আরও একটি জোরালো বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরের 'রহস্যময়' মৃত্যু। লিখছেন **হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রতিবাদ। বার্লিন শহরে রুশ দূতাবাসের সামনে *এপি*

সবুজ গাছপালা তো দূরের কথা, ঘাস-পাতার একটা ডগা পর্যন্ত দেখার উপায় নেই। সাইবেরিয়ার জেলের সেল থেকে এই মাস কয়েক আগেই লিখেছেন তিনি। এক বন্ধুকে। হাঁটাহাঁটিরও উপায় নেই, নড়াচড়া খুব বড়জোর পাশের সেল পর্যন্ত।

তবে এর জন্য তিনি খুব বিমর্ষ, মুষড়ে পড়েছেন, এমনটা কিন্তু চিঠির প্রাপকের মনে হয়নি। বরং সেই চিঠিতেই জানা গেল, এই জেলের সেলে বই পড়ার সুযোগে পেয়েছেন তিনি। ডস্টয়ভস্কি, নবোকভ, সলঝেনিৎসিন পড়ছেন। 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' আর এক বার পড়লেন। আর অবশ্যই টলস্টয় মন দিয়ে পড়ছেন আবার করে।

টলস্টয় না পড়লে কি চলে? সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীনই তো মোহনদাস গান্ধীর সত্যাগ্রহের অন্যতম অনুপ্রেরণা এসেছিল টলস্টয়ের থেকেই। ভিন্ন প্রেক্ষিতে, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়কালে আর এক প্রতিবাদী, সব অর্থে অহিংস সত্যাগ্রহী। একটা নির্ভীক হৃদয় ওই অমানবিক পরিবেশেও নিজেকে তরতাজা রাখতেন। এই সে দিন পর্যন্ত।

কিন্তু ভ্লাদিমির পুতিন নামক রোবট-সদৃশ অতিশক্তিধর নেতা এই তরতাজা মনকে এতটাই ভয় পেলেন যে নির্বাসনে পাঠিয়ে, খাঁচায় ভরেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাই সাতচল্লিশ বছরে মরতে হল আলেক্সেই নাভালনি-কে। কেন, কী ভাবে মরলেন, তার স্পষ্ট কারণ কেউ জানে না, কোনও দিন জানবেও না।

বছর আষ্টেক আগে একটা বই বেরিয়েছিল মনে আছে? নাম 'অল দ্য ক্রেমলিন্স মেন'। লেখকের নাম মিখাইল জ়িগার, যিনি সেই সময়ে 'দোঝদ' (Dozhd) টিভি চ্যানেলের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, এবং নির্ভীক পুতিন-সমালোচনার অপরাধে শাসকের রক্তচক্ষুর শিকার হয়েছিলেন। সব কেব্‌ল ও স্যাটেলাইট অপারেটরদের বলে দেওয়া হয়েছিল, এই চ্যানেলকে ব্ল্যাক আউট করতে হবে।

সেই জ়িগার-এর সঙ্গে প্রায় শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল নাভালনির। জ়িগার-এর ওই বইয়ে ত্রয়োদশ চ্যাপ্টারটি এক অর্থে নাভালনি-র জন্যই নিবেদিত। তিনি লিখেছিলেন, 'আলেক্সেই নাভালনি এক অদ্ভুত মানুষ। তার কোনও পাওয়ার এই মুহূর্তে নেই, তিনি বিলক্ষণ জানেন। কোনও দিন ভবিষ্যতে তিনি পাওয়ার বা ক্ষমতা করায়ত্ত করবেন, এমন নিশ্চিত প্রত্যয় যে তাঁর আছে, সেটাও কিন্তু নয়। তা সত্ত্বেও তিনি নির্ঝঞ্ঝাট, নিশ্চিন্ত, ছাপোষা জীবনযাপনের রাস্তায় হেঁটে অসম শক্তির বিরুদ্ধে নীরব অথচ দৃঢ়চেতা লড়াইয়ে নেমেছেন। কারণ তিনি এটা বিশ্বাস করেন, তাঁর এই অবস্থান এক দিন না এক দিন রাশিয়াকে বদলাবে। পরিবর্তিত রাশিয়া। বাসযোগ্য রাশিয়া। দুর্নীতিমুক্ত, স্বৈরাচারমুক্ত রাশিয়া।'

অনেক পণ্ডিত বলেন, গর্বাচভ-এর গ্লাসনস্ত-এর সাময়িক খোলা হাওয়া জমানার আগে-পরে রাশিয়া যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে গেছে, তাতে দেশের মানুষ সিনিক্যাল হয়ে গেছেন। এতটাই যে, দেশের বহু মানুষ সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন, বিশ্বের কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্র নেই, বাক্‌স্বাধীনতা নেই। চার দিকে শুধু প্রোপাগান্ডা আর প্রোপাগান্ডা। ন্যায়বিচার ব্যাপারটা এক অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

সহযোদ্ধা। মিখাইল নাভালনি ও তাঁর স্ত্রী ইয়ুলিয়া ▶

এই সর্বগ্রাসী নিরাশাবাদের আবহেও, নিরন্তর পুতিন ও তাঁর বাহিনীর শাসানি ও রক্তচক্ষুর সামনে, দমবন্ধ করা বিষবাষ্পের পরিবেশেও এক অবিশ্বাস্য আশাবাদ নিয়ে বেঁচেছেন নাভালনি। গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা, ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ আপসহীন ভাবে আঁকড়ে বেঁচেছেন এবং এর জন্যই তিনি মরলেন।

নিন্দুকেরা বলেন, পথের কাঁটা সরাতে জুড়ি নেই পুতিনের। খুব ভালোই জানেন, ক্রিটিক বা শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই নাভালনি-দের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। যার শেষতম সংযোজন বলা যায় গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপরভ। আর?

ইয়েভগেনি প্রিগোজ়িন-এর কথা বলা যায়। ইউক্রেন-এর সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয় রাশিয়ায়। বন্দুকধারীদের নিয়ে ক্রেমলিনের দিকে এগোতে থাকে রাশিয়ার বেসরকারি সেনা সংস্থা ওয়াগনার। চিফ ইয়েভগেনি সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে পুতিনকে উৎখাত করে দেশের দখল নিতে চলেছেন বলে খবর আসে। কোনও ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয় বেলারুস। কিন্তু সব মিটল কই! গত অগস্ট মাসে খবর আসে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ইয়েভগেনি। না কি নিহত? বিমানের রুট ছিল মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ— পুতিন-এর হাতের তালু। তবে ইয়েভগেনি-র মৃত্যুতে পুতিনের হাত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে ক্রেমলিন।

আরও তিনটি নাম। এক, রাভিল মাগানভ। রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী সংস্থার চেয়ারম্যান ইউক্রেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে সরব ছিলেন গোড়া থেকেই। ওপেনলি সমালোচনাও করেন পুতিনের। এর ছ'মাসের মাথায় মৃত্যু হয় তাঁর। মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আচমকা হাসপাতালের ছ'তলার জানলা থেকে পড়ে মৃত্যু। সেটা ছিল গত দু'বছরে অষ্টম রুশ তৈল কর্ণধারের রহস্যমৃত্যু। সবাই আবার পুতিন সমালোচক! দুই, আলেকসান্দর লিৎভিনেঙ্কো। রাশিয়ার বিদ্রোহী নেতা। ২০০৬ সালে লন্ডনে হঠাৎই অসুস্থ। জানা যায়, তাঁর চায়ের কাপে মেশানো ছিল তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম-২১০। মরতে সময় লাগেনি। শেষবেলায় বোমা ফাটান। লিৎভেনেঙ্কো জানান, সোভিয়েত যুগের বিষ তৈরির একটি গবেষণাগার এখনও চালু রাশিয়ায়। তিন, আনা পলিৎকোভস্কায়া। রুশ সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী অ্যানার রহস্যমৃত্যু নিজেরই অ্যাপার্টমেন্টের লিফ্টে। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। এবং সের্গেই স্ক্রিপল অবশ্যই। রাশিয়ার প্রাক্তন গুপ্তচর ২০১৮ সালে ব্রিটেনে বিষক্রিয়ার শিকার হন বলে অভিযোগ। তাঁর মেয়েকেও বাদ দেয়নি ঘাতকরা। এঁদের সংস্পর্শে আসা এক ব্রিটিশ মহিলারও মৃত্যু হয়। গুরুতর অসুস্থ হন এক পুলিশ আধিকারিকও। সম্ভবত পুরোটাই বিষ নোভিচক-এর খেল!

কিন্তু এই সব রহস্যাবৃত অকালমৃত্যুর মধ্য দিয়েই কি চিরকালের জন্য নীরব হয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা? নাভালনি-র বন্ধুবর জ়িগার কিন্তু মনে করেন, আজ যাঁরা দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে নাভালনির মৃত্যুতে শোকার্ত, আরও প্রবল ভাবে ঘৃণা করছেন পুতিনকে, তাঁরা রাশিয়ার ভবিষ্যৎ। তাঁরা নাভালনির মূল্যবোধকে জ্বালিয়ে ও জাগিয়ে রাখবেন ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো। তাঁরা চোয়াল শক্ত করে শপথ নেবেন, 'এসো আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। আমার জন্য তুমি আছো। তোমার জন্য আমি। আমরা পারব। পারতেই হবে। হাতে হাত মিলিয়ে।'

শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন

বিভিন্ন বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

পাঠান ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'প্রতি সম্পাদক'। চিঠি পাঠান পত্রিকার ঠিকানায়। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন।
ই-মেল: eisamay@timesgroup.com